আলোচনা: চন্দ্রাবতী – দীনেশচন্দ্র সেন

একেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাই কেহ।
জলের উপরে ভাসে জয়চন্দ্রের দেহ॥
দেখিতে সুন্দর কুমার চাঁদের সমান।
ঢেউ এর উপরে ভাসে পৌর্ণমাসী চাঁদ॥
আঁখিতে পলক নাই মুখে নাই বাণী।
পাড়েতে দাঁড়াইয়া দেখে উন্মত্তা কামিনী॥

এইখানে কবি নয়নচাঁদ চিত্রপটের উপর যবনিকাপাত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি, এই দুর্ঘটনার পর চন্দ্রা আর বেশীদিন জীবিত ছিল না। পিতার আদেশে রচিত রামায়নখানি অসমাপ্ত রাখিয়া ফুলেশ্বরী নদীর তীরের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুলটি অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কোন কোন সুধী সমালোচকের মতে 'চন্দ্রাবতী' পল্লীসংগীতগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনের যোগ্য।

এই গানটীর একটী বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে হিন্দুর আধ্যাত্মিকত্ব আছে। পল্লী - আখ্যায়িকাগুলির অপর কোনটীতে তাহা নাই,—তাহাদের সকলগুলিতে প্রেম অপরাপর প্রসঙ্গে নিছক বাস্তবতা দৃষ্ট হয়, সেই প্রেম খুব উচ্চ গ্রামে উঠিয়া স্থানে স্থানে আদর্শলোকে পৌঁছিয়াছে সত্য, কিন্তু হিন্দুর জপ, তপ, নাম-কীর্তন প্রভৃতির লেশ তাহাতে নাই। যোগের সমাধি এবং সংসারের ঊর্ধে আত্মার যে উচ্চস্থান পরিকল্পিত হয় – পল্লীগ্রামের গীতিকাগুলির কোথাও তাহার আভাস নাই। বৌদ্ধধর্মে আত্মার অস্তিত্ব ও ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থান পায় নাই, কিন্তু তাহাতে কর্মফলের প্রতি খুব অতিরিক্ত মাত্রায় জোর দেওয়া আছে। গল্পগুলিতে বৌদ্ধ-প্রভাবের নিদর্শন আছে। এইখানে তাহা আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। চন্দ্রাবতীতে ব্রাহ্মণের আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে, এই হিসাবে কুমারী চন্দ্রাবতী অপরাপর গল্পের নায়িকা হইতে একটু ভিন্ন প্রকারের। তাহার চরিত্রে আগাগোড়া ব্রাহ্মণ-কন্যার যোগ্য সংযোমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় – অথচ তাহা শুষ্ক কাষ্ঠের মত নিরস নহে। একদিকে বাস্তব জগতের হৃদয়োচ্ছ্বাস পূর্ণমাত্রায় – অপর দিকে তপস্যা-জনিত সংযম তাহার চরিত্রে মিশ্র-সৌন্দর্যের চিত্র দেখাইতেছে।

তাহার ভালোবাসা খরতোয়া নদীর মত অতি বেগে চলিয়াছে; কিন্তু অপরাপর পল্লী-চিত্রে সেই ভালোবাসা যেরূপ অবাধ এবং শেষ পর্যন্ত সেই ভালবাসাই পূর্ণমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এই গল্পে তাহা নহে। চন্দ্রাবতীর ভালবাসার আবেগ প্রতি পদে পদে বাধা মানিয়া চলিয়াছে, চঞ্চল হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাস সর্বত্রই সংযম ও তপস্যার অধীন হইয়া চলিয়াছে।

ফুল তুলিবার আগ্রহ, জলে সাঁতার কাটা, জয়চন্দ্রের গলায় ফুলমালা পরাইয়া দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে চন্দ্রাবতীর মুক্ত হৃদয়ের সরল স্বাভাবিক গতি পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু যে মুহূর্তে জয়চন্দ্র তাহাকে প্রেম নিবেদন করিয়া চিঠি লিখিল – সেই মুহূর্ত হইতে তাহার নিজ হৃদয়ের প্রতি প্রথম দৃষ্টি পড়িল, সে সাবধান হইয়া গেল। যদিও সে মনে প্রাণে জয়চন্দ্রের অনুরাগী ছিল, এবং মনের নিভৃত কোণে যে দেবতার দৃষ্টি, সেই দেবতাকে তাহার মনের আকাঙ্খা নিবেদন করিতে কুন্ঠিত হইল না – তথাপি বাহিরে সে সতর্ক হইয়া গেল। এই সতর্কতা, এই সংযম সে জোর করিয়া আনে নাই। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশের শোনিতে ইহার অস্তিত্ব বিদ্যমান। চন্দ্রাবতী যেদিন প্রথম প্রণয়-চিঠিখানি পাইল সেই দিন হইতেই ফুলেশ্বরী নদীর পারে ফুল কুড়াইতে যাওয়া ছাড়িয়া দিল। চিঠি পাইয়া সে একবার দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল – 'এ কি করিলে, তোমার মুখখানি দেখার সুযোগ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিলে?' তদবধি সে নিজের আঙ্গিনায় যে জবা, নাগেশ্বর, চাঁপা ও গান্ধা ফুটিত, তাহাই কুড়াইয়া পিতার পূজার আয়োজন করিতে লাগিল। জয়চন্দ্রের সঙ্গে দেখাশুনা সমস্তই বন্ধ হইয়া গেল। এই সংযম তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব।

জয়চন্দ্রের পত্রের উত্তরে সে দুইটী ছত্র মাত্র লিখিল। তাহার হৃদয়ে প্রবল উচ্ছ্বাসের কোন কিছু তাহাতে ছিল না, অপূর্ব সংযম-সাবধানতায় সে পত্রখানি লিখিয়াছিল, 'আমি কি জানি? আমার পিতা আছেন, তিনিই কর্তা।' এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের ভিতর তাহার হৃদয়ের বেগবতী ভালবাসার একটী ঢেউ আসিয়া পড়ে নাই। তাহা সংযমশীলতার পরিচায়ক।

প্রথম লিপি পাইয়া সে তৎক্ষণাৎ কোন কৌতূহল প্রকাশ করে নাই, অপর কোন নায়িকা হৃদয়ের অদম্য আবেগে তখনই পত্র পড়িবার জন্য উৎসুক হইত। কিন্তু চন্দ্রা পত্রখানি আঁচলে বাঁধিয়া ফুলগুলি সংগ্রহ করিল, পিতার ঠাকুর ঘরখানি মার্জনা করিল, পুষ্পপাত্রে আহৃত ফুলগুলি সাজাইয়া রাখিল, পিতার জন্য আসন পাতিল ও চন্দন ঘষিল। বংশীদাস পূজোপকরণের পার্শ্বে আসনে আসিয়া চোখ বুজিয়া ধ্যানে বসিলেন, তখন চন্দ্রা নিজ কক্ষে যাইয়া চিঠিখানি পড়িতে বসিল। অথচ তাহার মনে যে কৌতূহল ও পিপাসা জাগিয়াছিল তাহা অতি প্রবল। সর্বত্রই চন্দ্রা রমণীজনোচিত, ব্রাহ্মনকন্যার শোনিতের বিশুদ্ধতাজনিত সংযোমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আসিয়াছে – তাহা কষ্ট-কৃত নহে, স্বভাবই তাহাকে এই সংযত চরিত্রের ভূষণস্বরূপ গড়িয়া

দিয়াছিলেন।

যেদিন ভয়ানক বিপদের সংবাদ আসিল, – কোথায় রাম রাজা হইবেন, তাঁহাকে বনবাসী হইতে হইল! – তখনকার চন্দ্রার চিত্র অতি অপূর্ব। চারিদিকে কান্নাকাটি – আর্তনাদ, কিন্তু যাহার মাথায় বাজ পড়িয়াছে – সে একেবারে নিশ্চল ও অবিচলিত। অথচ তাহার প্রেমে – স্বাভাবিক দুঃখ-বোধ ও নিরাশার ভাবের এক বিন্দুও ব্যত্যয় হয় নাই, তাহার চিত্র তখন মৌন সন্ন্যাসিনীর চিত্র, উহার দৃষ্টান্ত সমাজে দেখা যায় না। 'ধারয়ন্ মনসা দুঃখং ইন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য চ' – ইহা সেই যোগসাধনার প্রথম অবস্থা।

চন্দ্রা পিতার উপদেশের মর্মাগ্রাহী ছিল। একবার যখন তাহার মন একটুকু হেলিয়া পড়িবার মতন হইয়াছিল তখন পিতার উপদেশে হৃদয়ের গতিমুখ সে ফিরাইয়াছিল, তাহাতে তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তপস্যার গুণে সে সেই অবস্থা অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল। পিতা তাহাকে বিবাহ দিয়া পুনরায় তাহাকে সুখী করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রা যখন নিজে ধর্মের পথ বাছিয়া লইল, তখন তাহার সাধু তেজস্বী পিতা তাহাকে একটীবার বাধা দিলেন না। কিন্তু যখন তাহার কঠোর তপস্যার ভাব কথঞ্চিৎ শিথিল হইবার উপক্রম হইল, জয়চন্দ্রের চরম দুর্দশা ও অনুশোচনা-সূচক চিঠিতে যখন দুর্দম পদ্মাস্রোতের ন্যায় তাহার হৃদয়ের সংযম বাঁধ ভাঙ্গিবার উপক্রম করিল, তখন সাধু পিতা সেই দুর্বলতার প্রশ্রয় দিলেন না। তিনি কতকটা কঠোরভাবে তাহাকে কর্তব্যের পথ দেখাইয়া দিলেন – চন্দ্রা সেই উপদেশ শিরোধার্য করিয়া লইল।

তারপর পল্লীগীতিকা-দুর্লভ সমাধির চিত্র। চন্দ্রার যোগসমাধির ছবিখানি

অবৃষ্টি-সংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুমত্তরঙ্গম্
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপং॥

কিন্তু এই বাঙ্গালী যোগিনী-মূর্তি কালিদাসের নকল নহে, কোন শ্লোকের পুনরাবৃত্তি নহে, তাহা পল্লীর মৌলিক চিত্র। পল্লীতে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে যে তপস্যা চিরকাল চলিতেছিল – ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। নিম্নশ্রানীর মধ্যে সেই সমাধির ভাব তখনও অনাস্বাদিত, এজন্য গীতিকায় তাহার ছায়া পড়ে নাই। পল্লীগীতিকার মূলে বৌদ্ধ প্রভাব ক্রিয়া করিতেছিল।

এই গল্পের বিশেষ একটা দিক এই যে ইহাতে বাস্তব ও অবাস্তবের মিলন দৃষ্ট হয়। তপস্যা, সংযম প্রভৃতি অধ্যাত্ম জীবনের তত্ত্ব ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে – তাহা সূত্রাকারে নহে, সহজ সরল সত্য পরিষ্কার কবিত্বের ভাষায় কথিত হইয়াছে – তাহাতে জ্ঞানী বা দার্শনিকের শুষ্কতা বা জটিলতা নাই – গল্পের ছন্দে বা বর্ণনায় তাহা বেখাপ্পা হয় নাই। অথচ প্রেমের গভীরতায়, উপলব্ধির গাঢ়তায়, অবস্থার বৈগুণ্যে, আত্মদানের মহিমায় – এই নায়িকা শ্রেষ্ঠ-কাব্য-বর্ণিত প্রেমিকাদের এক

পংক্তিতে সমাসীন। যেমন উন্মত্ত উচ্ছ্বাসিত সেই প্রেমের প্লাবন, তেমনই কঠোর শক্ত সেই সংযমের বাঁধ — আত্মহারার আত্মদান ও তপস্বীর সাধনা একত্র এই মহান দৃশ্যপটে দেখা যাইতেছে। পদ্মার ভাঙ্গন পাড়ে দাঁড়াইলে যে বিস্ময়কর দৃশ্য চক্ষে পড়ে — ইহা তাহাই। ঘনঘটা করিয়া উন্মত্ত তরঙ্গ অবাধ শক্তিতে ছুটিয়াছে, আকাশ বক্ষ প্রসারিত করিয়া সেই তরঙ্গকে বাধা দিতেছে। পৃথিবী ও স্বর্গ দিগ্বলয়ে পরস্পরকে ছুঁইয়া আছে, যেন প্রেম বড় কি সংযম বড় এই সমস্যার সৃষ্টি করিবার জন্য।

চন্দ্রাবতী তাহার পিতা বংশীদাসের সঙ্গে একযোগে মনসাদেবীর মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। তাঁহার মাতার নাম অঙ্জনা, ফুলেশ্বরী নদীর তীরে ইঁহারা খড়ের কুটীরে বাস করিতেন। ১৫৭৫ শকাব্দয় 'মনসার ভাসান' রচিত হয়, তন্মধ্যে কেনারামের পালাটী সম্পুর্ণ ইহার রচনা। কবিত্বে ও করুণ রসে সেই কাহিনীটীর জোড়া পাওয়া দুর্ঘট। চন্দ্রাবতীর দ্বিতীয় মলুয়া — পল্লীগীতিকার শিরোমণি; পূর্বেই লিখিয়াছি, চন্দ্রাবতী পিতার আদেশে যে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আংশিক ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে যে সকল মহিলা-কবির রচনা পাইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রাবতীর অবিসংবাদিত ভাবে সর্বোচ্চ আসন। ১৫৭৫ শকে অর্থাৎ ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রা পিতার সহযোগে মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে চন্দ্রাবতীর জীবনের অনেক কথা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে জয়চন্দ্র-ঘটিত প্রেম-কাহিনীটি বাদ পড়িয়াছে, ইহা স্বাভাবিক লজ্জা ও সম্ভ্রম বসত্ই হইয়াছে। অপর সকল বৃত্তান্তের সঙ্গে নয়নচাঁদ কবি বর্ণিত আক্যায়িকার খুব মিল আছে। ময়মনসিংহ পাতুয়ার গ্রামে বংশীদাসের বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছেন। আমি অন্যত্র দেখিয়াছি, মাইকেল মধুসূদন-কৃত মেঘনাদবধ-কাব্যের সীতা-সরমার কথোপোকথনের অংশটী সম্ভবত কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাংলার পুরনারী, দীনেশচন্দ্র সেন

সুদীপ্ত মুখার্জি, ইন্সটিট্যুট অফ ফিসিক্স